গল্পের আনন্দ

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সংগ্রহর ১ম খন্ডটি এ বছরের মার্চ মাসে আমার হাতে আসে । বাংলা প্রকাশনা জগৎ মহাকালে বিশ্বাস রাখে। পশ্চিমী সময় চেতনার ধার তারা বিশেষ ধারে না। ফলে গল্পগুলি কোন বছরে প্রকাশিত, তা জানাবার উপায় নেই । অথচ এটা না জানলে একজন গল্পকারের হয়ে ওঠাকে বোঝা যায় না। তাঁর গল্পের জগৎটাও পথ-প্রকৃতি, ঘর-বাহির স্পষ্ট হয় না । লেখকের কয়েক টুকরোকথা থেকে জানতে পারি ১৯৭০ এর দশক থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে মোটামুটি আড়াইশো গল্প তপন লিখেছেন । আরও জানতে পারি , "শেষ গল্প ইদুঁর" প্রকাশিত হয়েছিল নববুইতে ।" শেষ গল্প মানে , এই সংকলনের শেষ গল্প ? নববুইয়ে র পরে ও তো তপনেরগল্প চোখে পড়েছে । তবে কি এ সংকলনের গল্পগুলি প্রকাশকাল ১৯৭৬-৭৭ থেকে ১৯৯৯ ? এই আড়াই শো গল্পের রচনা সময়পচিঁশ বছর ----বছরে গড়ে দশটি । তার মধ্য থেকে পঞ্চাশ টি গল্প এই সংকলনে আছে ---"যে গল্প গুলো পাঠক এখনও মনে রাখতে পেরেছেন ,শুধুমাএ সেরকম ই পঞ্চাশটি গল্প প্রথম খন্ডেমলাট বদ্ধ করলাম ।" তপন পাঠকের চি , ভালোলাগাকে বিশেষ সম্মান দিয়েছেন ----পরবর্তী খন্ডগুলিতে নিশ্চয় না - মনে রাখা গল্পের আধিক্য ঘটবে । পাঠকের ভাল লাগা ,মনে রাখা ও তাঁর শ্রেনী সামাজিক অবস্থান -স্থান কাল -পঠন মননের ওপর নির্ভরশীল । হয়তো দেখা যাবে ঐ না মনে রাখার গল্পগুলির মধ্যে এমন গল্প আছে যা আমার মত পাঠকের কাছে , এই না মনে রাখার গল্পগুলি থেকে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ও বহুমাত্রিক ।

মার্চে পাওয়া পঞ্চাশটি গল্প সংকলন আমার পড়তে সময় লাগল প্রায় তিন মাস । ধীরে ধীরে গল্পগুলি পড়েছি ---যেমন কোন সুগন্ধকে গায়ে মাখার জন্য অল্প অল্প খরচ করি যাতে ফুরিয়ে না যায় । সুস্বাদু খাবার ধীরে ধীরে খাই স্বাদটা দীর্ঘায়িত হয় , তেমনি তপনের গল্প । কোন অকারন জটিল মার প্যাঁচ নেই । বলব কথা সামান্য কিন্তু তার জন্য পাঠককে গোলক ধাঁধায় টেনে নেওয়া নেই অর্থাৎ অকারন ঘোর প্যাঁচে পাঠক ক্লান্ত হন না । এক সরল ও সহজ পাঠযোগ্যতায় তপনের গল্প পাঠ এক আনন্দ বিশেষ । হতে পারে আমার এই ষাট বছরের চি হয়তো প্রৌঢ়ত্বে আত্রান্ত , খুঁজতে চায় কিন্তু পড়ার সহজ আনন্দ ---তপন এই প্রৌঢ়কে সেই আনন্দ দিয়েছে । তাই তপনের মত তাঁর গল্প যতটা সম্ভব সময় নিয়ে পড়েছি ও খরচ করেছি ।

তবে কি তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প শুধু বিনোদনের জন্য পাঠ ? একদিক থেকে তিনি কি শরবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উওরসূরী! ঘটনা কিন্তু তা নয় । তপনের গল্প জগতে একটা বড় অংশ এমন অভিজ্ঞতা নির্ভর যা আমাদের মধ্যবিও অস্তিত্ব ও বৃহওর অস্তিত্বর পরস্পর সংলগ্ন , যেন স্পর্শকের মত । চাকুরির সূএে নিজ জগতের শ্রেনীর সীমানা পেরিয়ে যে মানুষ বা মানুষেরা অন্য জগতে র সামনাসামনি দাঁড়ায় , কখনও ভেতর ঢোকে তার বা তাদের অভিজ্ঞতা কে তপন গল্পের উপাদান হিসাবে গ্রহন করেন কিন্তু অভিজ্ঞতা ই তো ছোট গল্প নয়। সাধারন ভাবে একজনের অভিজ্ঞতার কাহিনী আর একজনের জ্ঞান , জ্ঞানকে বাড়াতে পারে , নতুন জগতের সন্ধান দিতে পারে কিন্তু এ অভিজ্ঞতাকে যখন ছোটগল্পে অন্বিত করা হয় তখন অভিজ্ঞতা র মাটিকে শিল্পে রূপবন্ধনে অন্য অভিজ্ঞতা করে তুলতে হয় । বাইরের অভিজ্ঞতার বাস্তবটিকে শিল্পের বাস্তবে রূপবন্ধনে না করলে , ঐ বীক্ষা অভিজ্ঞতার গ্রহন বর্জন ঘটায় , রূপবন্ধন স্থির করে। এমনিতে অভিজ্ঞতা অ

াকার হীন , ব্যক্তিগত, তাকে আকার দেয় , নৈর্বক্তিক করে । শিল্পের অভিজ্ঞতা তাই ভিন্ন প্রকৃতির । কোন লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জগৎ বড় হলে , নিতান্ত তাঁর বীক্ষাকে বড় পরিসরে স্থাপন করতে পারেন । পরিসরে এই স্বাধীনতার তাৎপর্য' অভিজ্ঞতার শিল্পায়নের ওপর নির্ভর করে ।তপন তাঁর গল্পে আপাত সহজিয়ার আড়ালে একটা বীক্ষার বিন্দুতে দাঁড়ান । সরকার -আমলা -সরকারী উন্নয়ন ইত্যাদির একটা প্রচ্ছন্ন সমালোচনা তাঁর গল্পে জেগে ওঠে । এ বেশ দলীয় সমালোচনা নয় , নির্বিশেষভাবে আমলাতন্ত্র সরকারী উদ্যোগ কেমন ভাবে ঐ একেবারে মাটির কাছাকাছি মানুষের জীবনে পৌঁছায় , বিড়ম্বিত করে তা দেবে এ কথা নানাভাবে তিনি বলেন । মধ্যবিত্তরা সরকারের কর্মকান্ডে অনুঘটক ত াদের মধ্য দিয়ে সরকার বলা যায় রাষ্ট্র গ্রামে - গ্রামঞ্চলে মূর্ত হয়। এদের সংকটও তপন গল্পে নিয়ে আসেন । কখনও কৌতুকে , কখনও ব্যঙ্গে, কখনও বা প্রচ্ছন্ন বেদনায় , অসহায়তার বোধে ।

তপন এক ধরনের গল্পে দেখিয়েছেন আমলাতন্ত্রের হাস্যকর , কন এবং সাধারন মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে প্রায় অপ্রাসঙ্গি কতার দিকটি । এখানে তাঁর ব্যঙ্গ ও বেদনার উৎস ও লক্ষ্য কোন ব্যক্তি বিশেষ বা দল নয় । ব্রিটিশ আমলে গড়ে ওঠা , ৪৭-র পর মোটামুটি ভাবে অব্যাহত থাকা আমলা তন্ত্রের কাঠামোটিই তপনের গল্পের উপাদান । আর আমলাতন্ত্র বলতে তপন প্রসারিত একটি ব্যবস্থাকেই বুঝেছেন ; এর আইনবিধি এর কর্ম পদ্ধতি ; সব কিছুই কিছুটা ব্যঙ্গে , কিন্তু একটি কৌতুকের ছোঁয়াতে তপন নগ্ন করে দেন ------সাধারন মানুষের অসহায়তার কথা বলেন । আর এই গল্প বলার মধ্যেই আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সংলগ্ন কিন্তু বাইরের শোষন শাসনের কথাও বলেন । একেবারে ঘাসমূলের আকাড়া মানুষটির কথ াই বার বার বলতে চান ।

ধরা যাক ' ফড়িং হইল পক্ষী গল্পটি । গল্পে এ কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঐ মানুষের অভিজ্ঞতা সত্তর ও পরবর্তী সময় কোন মৌলিকপরিবর্তন আনে নি । গল্প টি শু হচ্ছে এভাবে ঃ" বাগানে পায়চারি করতে করতে হলুদ দাঁতে নিমের দাতন ঘষছিলেন বাগুইবাবু , হঠাৎ কী মনে হতে বললেন , তুই তো ভূমিহীন চাষীরে যতন সরকার ভূমিহীনদের খাসজমির পাট্টা দিচ্ছে তা তুই একটা নিস নে কেন? এই একটি সংলাপ এক বৃহত্তর ডায়ালগের দিকে নিয়ে যায় যা ভূমিহীন চাষীর স্বপ্ন, একখন্ড ভূমির মালিক হওয়া, নিজ জমি পাওয়া । এৰপর যতনের ঐ খাসজমি পাবার যাত্রা এ সময়ে বিকেন্দ্রীকৃত আমলা তন্ত্রের ছবি আঁকা হয়------যতনের জেলারো সাহেবের অফিসে যাওয়া , আমিনবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়া পঞ্চায়েত মেম্ব ার ও প্রধানের সামনে দাঁড়ানো আর বাগুইবাবুর যতনকে উসকে দেওয়া নিজেরই ধান্দায় । এই কাহিনীতে একেবারে ভিন্ন ধরনের একটি গল্পের কথা মনে পড়ে ------শিবরাম চত্রবর্তীর সেই ব্যাগখোলা বন্ধ করার গল্প । এখানে যতন যে চত্রপথে ঘোরে তাতে সে কোন চপেটাঘাত করতে পারে না , ইতিহাস ও শ্রেনীর কারনে কিন্তু এই করতে করতে সে নামহ ারা হয়ে পড়ে -যতন নামনি সরকারী - পঞ্চায়েতী প্রত্রিয়ায় লুপ্ত হয়ে যায়। ভূমিহীন ----এই অভিজ্ঞান ই সামনে আসে । সে যখন শোনে আমিন বাবু তার জন্য একটি ছত্রিশ ডেসিমেল শালি জমি পেয়েছে ,তখন তার খাসজমি মালিক হওয়ার স্ বপ্ন ডানা মেলে ঃ ফড়িং যেন পক্ষী হয়ে উড়তে চাইল নীল আকাশের গভীরে । কিন্তু লিষ্টিতে তার নাম ভূমিহীন নঙ্কর । আ মিনবাবু কে তো সবাই বলেছে ভূমিহীন কে পাঠাচ্ছি। জমিহারা যতন নামহারাও হয় , এ সময়ের বৃত্তে । নামহারা হয়ে সে কিজমি পায়? বাগুই বাবু জানিয়ে দেন , যতনের নামে অনেক দাদন তাঁর খাতায় জমে আছে । খাস জমিটা ক বছরের জন্য বাঁধা রাখতে হবে তাঁর কাছে । আর জমিটা বোধহয় শিকস্তি চলে গেছে । নদীর ভাঙনে ---- নদীর গর্ভে । পার ভাঙ ার খেয়ালে কবে হয়তো সেই জমি যতনের কাছে ফিরে আসবে। যতন জমি পাওয়ার টিপসই দিয়ে বসে থাকে নদীর কিন ারে । নদীর জল তার পা ছুঁয়ে বলে যায়---এই ভালো না হলে জমিটা বাগুইবাবুর গর্ভে যেত । এখন নদীর গর্ভে --ঐ গর্ভের ভূমিখন্ডটা এখন একমাত্র তার ।" সেও তো কম নয় ।তার ভূমিখন্ডের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এই বিশাল গাঙ , এমনকি সমুদ্দুর ও ।এই নদী এত বড় সমুদ্র বলতে গেলে , এ সমস্তই তো এখন তার ।" যতন সময়ের সমাজ-সরকার র াষ্ট্রের হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসে । অলক্ষ্য ভূমিখন্ডটি এখন তার স্বপ্ন কে নদী সমুদ্র করে তোলে লুকিয়ে পড়া ঐ ভূখন্ডত াকে নদী -সমুদ্র মালিক করে তোলে । তার ভূমিখন্ডের ওপর দিয়ে ঐ জলস্রোত বহে যাচ্ছে ------ইতিহাসে কোন ভবিষ্যতের দিকে ভূমিহীন যতনের কোন স্বপ্নের রাজ্যে ?

বিষয় যখন গনা ” গল্পটিতেও জমি গল্পের মূলে । তবে এ গল্পের গনার চাষে জমির ওপর দিয়ে পঞ্চায়েত রাস্তা চলে যাচ্ছে ----আদিবাসী গনার জমির অনেকটা রাস্তার গর্ভে । এই বিষযটিকে সামনে রেখে দলতন্ত্র, ভোটতন্ত্র কি রকম দলা বাঁধে , বিমূঢ় গনা পরস্পর যুধ্যমান দুই পক্ষের মাঝখানে অসহায় হয়ে পড়ে সেটাই গল্প । ঐ ভূমিহীন চাষী যতন আর আদিবাসী গনা একই বাস্তবের মধ্যে অসহায়, কেবল তাদের গল্পটা আলাদা। শেষ পর্যন্ত দলতন্ত্র ও ভোটতন্ত্র দুই পক্ষকে মুখোমুখি সংঘর্ষে নিয়ে আসে । যুযুধান দু পক্ষের একটির পুরোভাগে রাখা হয়েছিল গনাকে । পুলিশ গুলি চালায় ---- মারা যায় একজন গনা মুর্মু । তার শবদেহ নিয়ে এক পক্ষ মিছিল বার করে ---ভোট এসে গেছে । কে মরেছে ,কার মড়া । ভিড়ের মধ্য থেকে উত্তর আসে গনা নাকি গননাথ, সে কি গনতন্ত্র । দলতন্ত্র-ভোটতন্ত্র গনতন্ত্রকেই গনাদের ই তো হত্যা করেছে ।

‘অথ ভূতঅশ্বথতলা সংবাদ ’ গল্পটির আপাত কৌতুক ভেঙে দিলে চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । অটল কুমার দাস এর গল্প এটি । অটল একটা গরিব গুর্বো লোক , ভিটেটুকু ছাড়া একছিটে জমি বলতে কিছুই নেই । সে ভূত অশ্বথতলায় হাপিত্যেস করে বসে আছে তেনাদের অপেক্ষায় । তাকে কাজকর্ম কেউ দেয় না , কাজ করতে গেলে কেবলি ঘুমিয়ে পড়ে । তাই বসে আছে তেনাদের জন্য ।যদি ভর করে শরীরে ,তাহলে একটা হিল্লে হয়ে যায় । অটলের বাবার দুই বিঘে ,সব মিলিয়ে সাতটি ছেলেমেয়ে। বাবা শুঁড়ির দোকান ধেনো খেয়ে এসে সেই যে চোখ উল্টে পড়লে আর উঠলো না । বাইশ না পেরনো অটল একগলা জলে । তাই তেনাদের আশায় সে বসে -----ভূতেরা তাকে যদি উদ্ধার করে ।বসে থাকতে থাকতেই দেখা হয় যুধিষ্ঠির খুড়ো , নবীন মাস্টারের সঙ্গে । কাঁকরোল পুরের একাদশী মন্ডল কে ভূতে পাওয়ার পর অটলের মাথায় এ ভূত ভাবনা আসে। একাদশীরও নেই , দেড়গন্ডা বাচচা তোয়ের করে ফেলেছে দেড়কুড়ি বছরের মধ্যে , একাদশীর ঘাড় থেকে ভূত নামার পর সকলে বললো ওর একটা হিল্লে হওয়া দরকার । সামনে পঞ্চায়েত ভোট , পঞ্চায়েতেরও টনক নড়লো , । একাদশীর হিল্লে হতে চলেছে এ খবর পেয়েই অটলও এসে বসেছে ভূত অশ্বথতলায়। যুধিষ্ঠির খুড়োকে পঞ্চায়েত মেম্বার খুব ঘোরাচেছ জমি রেকর্ড করার জন্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নবীন অটলের মাষ্টার মশাই , একদা প্রচুর জমির মালিক এখন সরকারি আইনে দরিদ্র , অবশিষ্ট জমিতে ভাগচাষীরা বেগ দিচ্ছে । নবীন এয়ারফোর্সে চলে যাওয়ার ছেলের গল্প অটলের কাছে বলে ----“ ছেলে রোজ উড়োজাহাজ চালায় এখন । রোজ আমাদের ঘরের ওপর দে উড়ে যায়। শব্দ শুনলে নবীন মাষ্টার রা বাইরে আসে ছেলে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কথা বলে। অটল হ্যাঁ করে শুনে চেচিঁয়ে ওঠে হনস লেগস বিতিস্তার জং। নবীন ও তেনাদের আপেক্ষায় বসে ছিল। কোন লাভ হয় নি । নবীনের ক বিঘা জমি অবশিষ্ট জমি খাস হযেগেছে । তাই পঞ্চায়েত বাবুদের ধরতে যাচ্ছে। অটল একাদশী র সঙ্গে ও দেখা করে ।অটলকে একাদশী বলে ,“সারাক্ষন তুমি নাকি আগুন চাও লোকজনদের কাছ থেকে? এত আগুন কী করো ।’ অটল বলে আগুন স্টক করছে ।পরে যদি কাজে লেগে যায় ।পঞ্চায়েত একদশীকে দুবিঘা জমি দেবে বলেছে ।দুবিঘা জমিতে তিনবার ফসল পাট্টা পেলে ব্যাঙ্ক দেখিয়ে শ্যালো নিতে পারে , দুখানা হেলে গ কি নতে পারে । বিডিও অপিস থেকে লোন সাহায্য পাবে । ‘পঞ্চাৎ বলল , এখন তোমারই হবে যে গাঁয়ের জমিদার ।” স্বপ্ন , অটলের স্বপ্ন । ভূমিহীনের জমি পাওয়া উড়োজাহাজি কথাবার্তা । অটল চেঁচিয়ে ওঠে হাসে , বোলস মড়া, মড়ার ওপর খাঁড়া । কপশলা বৃষ্টি হওয়ায় গাঁয়ের চাষিবাসি মানুষ হাল লাঙল নিয়ে গ নিয়ে ছটফট করতে থাকে মাঠের ভেতর । যুধিষ্ঠিরের অবস্থাও তাই । হঠাৎ সে দেখে অটল ছাতা বাগিয়ে ছুটতে ছুটতে চলেছে , যেন সে কার মাথায় ছাতা ধরে আছে । অটলকে “ছাতায় পেইছে ।” এ যেন ছাতা ভূত । ভূতের তলাতেই তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল প্রধান বাবু । প্রধান বললেন , “অ্যাই ছোঁড়া এদিক শোন । তুই নাকি ভূতে পাবে বলে অপিক্ষে করছিস ? ধর , আমার ছাতাটা ধর । অটল ভূতের দয়া পায় , কিন্তু প্রধানবাবু এত জোরে জোরে হাঁটে সে তাল মেলাতে পারে না । দু-তিনদিন খায় নি তো । প্রধান বাবু ভরপেট খাইয়ে তাঁকে হাঁটা প্র্যাকটিস করতে বলে । যাতে রাস্তায় ধরাধরি করতে লোকে না পারে নানা চাহিদা নিয়ে ।তাই প্রধানবাবু অত জোরে হাঁটেন । অটলের তো তাহলে হিল্লে হয়ে গেল যেমন একাদশী কে ভূতে ধরে হয়েছিল । অটল ছাতা বাগিয়ে ছোটে , প্রধান সাহেবের মাথায় ছাতা ধরে ছোটে । ক্রমে তার মুখে চেকনাই আসে , সাজপোষাক পাল্টায় মুখে সিগারেট ।

সুনাডানপুরে প্রধান স্কোর স্কিম দেখতে তাকে পাঠান, দেখনেই নতুনজামা প্যান্ট, সিগারেট । কদিনের মধ্যে অটল দাসের আর ছাতা নেই , তার চেহারা আরও চকচক চলায় আরও জোর ,কথাবার্তায় আরো দাপট ।এখন নবনী মাষ্টারকে সে নবীনদা বলে সিগারেট আগুন চায় তার কাছে । এখন আর ছাতা লাগছে না -----“এখনপার্টিতে পেয়েছে আমায়।” প্রধানসাহেব বলেছেন অটল পঞ্চায়েত মেম্বার হবে । নবনী তার আর্জি অটলকে জানায় ।যুধিষ্ঠির খুড়োর ও শোনার সময় নেই ---হ্নর্স বোলস লেগস। ভূতে পাওয়া ভাষা তার মধ্যে । অটল দাস মিটিং করে অটল দাস বক্তৃতা দেয় । জ্বালাময়ী ভাষন , হনস লেগস ,হুট চটফট , মড়া মড়ার ওপর খাঁড়া ------ভূততন্ত্রের মন্ত্র বলে ।

গল্পটি একই সঙ্গে বেদনার, আবার তীক্ষন ব্যঙ্গেরও অটলের বাস্তব তার পারিবারিক বাস্তব যেমন আমাদের উন্নতির প্রগতির ফাঁকিকে দেখায় ,দেখায় সমাজের ঐ স্তরের দরিদ্রের নির্মমতাকে তেমন অশ্বথতলীয় ভূতের আশ্রয় নেওয়ার সামাজিক এজেন্সীগুলিরপঙ্গুত্বও ধরা পড়ে । আর এ অশ্বথ তলাতেই শেষ পর্যন্ত তিনি ’ অটলের কাছে আসেন , এখানকার অলৌকিক লৌকিক গ্রাম বাস্তবেভূত পঞ্চায়েত প্রধান ।ছাতা হাতে দৌড়ানোর একাদশী মন্ডলর ভূতে পাওয়া অবস্থাই। আর ঐ ভূতই অটলকে ক্ষমতার দিকে নিয়ে যায় ।তার মুখ দিয়ে যে শব্দ বেরোয় তা আপাত অর্থহীন , কিন্তু ভূতমন্ত্রের মত ।একটা ব্যঙ্গের তীক্ষনশলাকা গেঁথে যায় পাঠকের বোধে ।

গ্রামের নিম্নবর্গীয় মানুষের চতুর্দিকের নাগপাশের কথা তপন একাধিক গল্পে বলেন । কোন অলাতচক্রে এ সময়ের ঐ অভিমন্যুরা ধবংস হয় তার গল্প তপন শোনান । লেদো রাউতের বাবা চৌকদারের মৃত্যু্র সময় লেদো নাবালক হয়ে , চাকরির দাবি করে খাদু দিন্দ্যা , গাঁয়ের লোকের কাছে খাঁদু উকিলের প্ররোচনায় ।ভ্যান রিকশাচালক লেদো ঐ চাকরির আশায় খাদুর প্রক্রিয়ায় সর্বস্বান্ত হয় ।ইতিমধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান লেদোর বাবার পদে মাসিক ষাট বা দেড়শো টাকার চুক্তি তে আর একজনকে বহাল করেছে এবং একটা মামলাও জু হয়েছে তাকে রেগুরালটিজ করার জন্য । ভূমিহীন চাষীরা যে জমি স্বপ্ন দেখে , চেকিদারের ছেলে ও চাকরির ।ঐ স্বপ্ন কে ব্যবহার করে নানভাবে খাঁদু অর্থ আদায় করতে থাকে লেদোর কাছে থেকে --লেদো তার সর্বস্ব বিক্রি করে জোগাড় করতে থাকে । শেষে সে রায় শোনে তার পনের কাঠা শালি জমি আছে , ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে সে ভ্যান রিকশার মালিক । যে অ্যাকাউন্ট ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইমসিস থাকলে ডেথ ইন -- হারনেসের কোঠায় চাকরি পাওয়া যায় তা লেদোর নেই । লেদো কার্যত ইতিমধ্যে সবই হারিয়েছে ; হারাবার পরও সরকারি নথিতে সে এসবের মালিক । এ এক অদ্ভুত বাস্তব । খাঁদু উ চাপড়ে আবার একটা মামলার তোড়জোড় করতে চায় অন্যায়ের বিদ্ধে । লেদোদের কাছে আমরা ঐ উ চাপড়াছি আবহমান কাল ----সর্বস্বান্ত আজও তারা হচ্ছে কেবল এখন বোঝাচ্ছি সর্বহারা হয়েও লেদোরাই চালিকা শক্তি । ভোটতন্ত্র দশতন্ত্রের হাতাখুন্তি ।

এর পাসাপাশি আমলা ও আমলাতন্ত্র নিয়ে তপন তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকেই গল্পে আনেন । আমলা গল্পটিতে বি ডি ও এস ডি ও এঁদের কর্মক্ষেত্রের টানাপোড়েন , তাঁদের অসহায়ত্ব একটি সিস্টেমের মধ্যে তারতম্য ভাল -মন্দবোধের সংকট , দশ নেতাদের এম এল এর মধ্যে ই তাঁদের বেদনা , যন্ত্রনার বার্তাটি দিয়ে দেন , ‘আমলা ’শব্দটিতে এ সবই পাঠক পাবেন । দুই নেতার চাপ , শেষে ফোর্স পাঠানোর হুমকি , এস ডি ও স্নেহাংশুর বাঁচবার পথ খোঁজা । ঐ ফোর্স পাঠানোর হুমকি তে বিবদমান দুই নেতা নরম হয় । কিন্তু স্নেহাংশু অনড় হয়ে জানায় কাল ভোরেই ফোর্স দিয়ে সে যাচ্ছে ।এর পরই ফোন আসে টিউবওয়েলের সমস্যা তারা প্রায় মিটিয়ে এনেছে । কেবল এস ডি ও কে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে শালি ডাঙায় আগামী তিন মাসের মধ্যে একটা ডীপ টিউবওয়েল পোঁতা হবে । সেহাংশু লাফিয়ে ওঠে , প্রতিশ্রুতি তো দেয় জননেতার ভোট সামলাতে । দুই নেতাই জানায় এ নিয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা হয়েছে । তাছাড়া তাঁরা এত প্রতিশ্রুতি দেয় যে “আমাদের প্রতিশ্রুতি আর কেউ বিশ্বাস করে না ।” স্নেহাংশু নিজ চাতুর্যে এভাবে দুরাত্মাকে গলিয়ে ক্ষীর করে দেওয়ায় খুশি । যে এস ডি পি ও পরামর্শ দিয়েছিলেন ,“পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দিন , অপসে হয়ে যাবে ? তার সঙ্গেই ফোনের ভেতর দিয়ে হেসে ওঠে স্নেহাংশু । ভদ্রতায় যুক্তি দেখিয়ে , আলোচনায় ফল হয় নি । কিন্তু তারপর হঠাৎ থেমে যায় তার

হাসি টনটন করে ওঠে বুকের ভেতরটা ।এই আমলার চাকরিতে আরও তো বহুকাল জাগলারেরভূমিকা পালন করে যেতে হবে তাকে। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় নানারকম গল্প লেখেন । তার মধ্যে বেশ কিছু গল্প শুধু গল্পই ------নির্মানের চ াতুর্যে পাঠকে ধরে রাখে ।এর মধ্যে ই গভীর স্তরে পৌঁছে যান এই সব নানাবিধ গল্পে । বিবমিষা ' গল্পটি । শুকদেব মা ন্ডিদের গ্রামে যাত্রা করে অফিসের কয়েকজন জিপে চড়ে । সবুজ প্রকৃতি জঙ্গল , ডাকাতের ভয় তবে জিপের ভয় নেই ।ক ারনএকবার এস ,ডি পি ওর জিপ ধরেছিল ওরা ।এস ডি পি ওর রক্ষী গুলি ছোঁড়ে , ওরা ভয় পায়।এতো ডাকাতদের ও ডাকাত ।যারাশুকদেবদের পরব নাচগান দেখতে যায় তারা শহুরে বাবু মধ্যবিও ।এই অবদমন ভর্তি সমাজের মানুষরা প্রকৃতি সবুজ হতে পারে না নাচের আসরে নৃত্যের উন্মেষও তারা দেখে না , দেখে মেয়েদের শরীরকে । লোভী দৃষ্টিতে । ভৌগোলিক ভাবে খুব দুর না হলে, মনের ও অবস্থানের দুরত্বে এ এক ভিন্ন গ্রহ ।পঞ্চায়েতের মেম্বার কালাচাঁদ হুড়োর চেহারায় সেগুনগাছের উপমা । 'আমার ' মনে হয় সভ্যতা থেকে তিনলক্ষ মাইল দুরে এক নিস্তরঙ্গ জীবন । তারপর খ াওয়া -দাওয়া উচছল মেয়েদের পরিবেশন । ফেরার সময় নিখিলেশ জানায় সে অন্ধকারে ছলিয়াকে জড়িয়ে ধরেছিল । এর আগে তারা মেয়েদের দিকে জুলজুল তাকিয়েছে । বিলাসজানায় সে যা পেয়েছে তা স্বপ্নেও অনুমান করা যায় না ঃ ত ার ঘটনা জানকী বলে মেয়েটিকে বলে মেয়েটিকে লিখে । শুকদেব
কে তারা জানায় তাদের গাঁ দান, তবে আরও দান গঁয়ের মেয়েরা। শুকদেব হাসে --খুব কষ্টে আছে তাদের গাঁয়ের লে াকজন ।ঐ ছলিয়ার তো যক্ষা হয়েছে আর জানকীর কুষ্ঠ । দেখে কিছু বোঝা যায় না । বিলাস জিপের মধ্যেই বমি করে ফেলে ।এ গল্পের বিনির্মান করলে ধরা পড়ে মধ্যবিত্ত ইতিহাস , গ্রাম আদিবাসী জগতের সঙ্গের তাঁদের সম্পর্কের বিক ার। ধরা পড়ে আপাত বাস্তবের আড়ালে প্রকৃত বাসতব । ছলিয়া জানকীরা ঐ বাস্তবের প্রতীকী মাত্রা - আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ উচছল এ বাস্তব কোন ভয়াবহ রোগে আত্রান্ত তা আমাদের দুদিনের ফুর্তিতে, সফবে, গ্রাম দেখায়, বোঝা যায় না । বিদেশীদের বিবরনে বা স্বচছল জগতের ফোটোগ্রফ্রিতেওনা কিংবা ওপর ওপর উন্নতির অতিকথাতে ও এ বাস্তব চাপা পড়ে ।এ বাস্তব যক্ষা -কুষ্ঠআত্রান্ত ।বাস্তবের চেয়ে বাস্তব --মায়া বাস্তব যাদু বাস্তব নয় ।

এরকম ই আর একটি গল্প গিনিপিগ ।অলকেশ পর্নার সন্তান টিউ দুর্ঘটনায় পঙ্গু, হুইল চেয়ারেই ঘোরাফোরা , অলকেশ ছেলেকে একটি গিনিপিগ এনে দেয় ----অলকেশ জানায় গিনিপিগদের হৃৎপিন্ড , লিভার , কিডনি সব কিছু চিনতে হয় ড াক্তারি পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসাবে । বিজ্ঞানে র নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষাও মানুষদের আগে গিনিপিগদের ওপর করা হয় , এসব পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা টিউ জানে কারন তাকে নিয়ে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে , যদি সে আবার হাঁটতে প ারে স্বাভাবিক হয় , অলকেশ নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারকে টিউর চিকিৎসাকে টানে কষ্ঠ করে -- এমন হয় বাজারে গিয়ে অর্থের টানাটানিতে যখন যে ভাবে প্রাইভেট ফার্মের মধ্যম
কেরানির পুত্র না হয়ে একদিন পরেই রত্তলাভ কক । গিনিপিগ আসাতে টিউ তাকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে , পর্না অলকেশের সঙ্গে সিনেমায় যাওয়ার কথাও ভাবে পাশের বাড়ির কাজের লোককে রেখে ---প্রাইভেট ফার্মের কেরানির ত াও হয় না । ছেলে অসুখের নাম করে আগে অফিস থেকে আসতে চেয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত বস বলে ,"আপনার ছেলে তো ত্রনিক পেশেন্ট , না হয় কাল ডাক্তার দেখাবেন।" অলকেশ ক্ষুব্ধ, এত প্রাণপাত অফিসের জন্য করে আর এটুকু সুযে াগ পাবে না। সে এ কথাই বলতে গেলে , বেতনের কথা শোনে, না পোষালে অন্য জায়গায় চলে যেতেও পারে ।

কদিন পরে অপিস থেকে ফিরে এসে দেখে গিনিপিগটা নির্জীব হয়ে পড়ে আছে । টিউ তাকে আছাড় মেরে মেরে দেখেছে , ছাদ থেকে পড়লে এর পা ভাঙে কিনা । টিউর পা অসতর্কতায় ছাদ থেকে পড়ে ভেঙে ছিল । না আটবার ছাদ থেকে পড়েও মিশার অর্থাৎ গিনিপিগটার পা ভাঙে নি । টিউ এর প্রশ্ন অলকেশ অসহায় ----অলকেশ হাত দিয়ে দেখে পা ভেঙেছে । টিউ তাড়াতাড়ি ব্যান্ডেজ দিয়ে বেঁধে দিতে বলে নইলে মিশা ও কোনদিন তার মত হাঁটতে পারবে না । এর মধ্যেই অলকেশের অফিসে গোলমাল দেখা দেয় ----আচমকা ধর্মঘট হয় । কোম্পানি তাদের দাবি মানবে? নাকি সত্যিই তাদের ফ্যাক্টরি তুলে নিয়ে যাবে অন্য রাজ্যে ? বাড়ি ফিরে দেখল গিনিপিগটা শুয়ে আছে নিস্পন্দ , রত্তাত্ত । টিউ তাকে ভাঙা সিরিঞ্জ দিয়ে ইঞ্জেকশন দিয়েছে , তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে কিনা দেখতে বারবার ইঞ্জেকশন দিয়েছে । বাঁচানো গেল

না মরে গেল ।আর এই মৃত্যু সংবাদের মধ্যে নিমন্ত্রন চিঠি , সোনার কিছু দিতে হবে , পর্নার দাবী ।অলকেশ অসহায়ভাবে একটি নিরাপত্তাহীন চাকরি , দুবেলার অগ্নিগর্ভ যাতায়াত সব মিলিয়ে সে তো লক্ষ লক্ষ মানুষের একজন ।মানুষ কত কম পরিসরে কম চাহিদায় কম নিরাপত্তায় বেঁচে থাকতে পারে , তারই পরীক্ষা আয়োজন চারিদিকে ।অলকেশ বসে পড়ে , চোখে অন্ধকার দেখে আলো ছায়ার মধ্যে হামাগুড়ি দিতে থাকে টিউ উল্লাসে চীৎকার করে ওঠে , মা দেখে যাও বাবা কিরকম ভাবে হাঁটছে , ঠিক গিনিপিগটার মত ।"একটি পঙ্গু ছেলের যন্ত্রনা , মানসিকতা এ গল্পে পাঠককে যেমন অসাড় করে দেয় , তেমনি অলকেশের ওই গিনিপিগ হওয়া ।সব পরীক্ষা নিরীক্ষা তো তাদের আমাদের ওপরই ---এখন বিশ্বায়নের মারাত্মক পরীক্ষার গিনিপিগ আমরা । নিরাপত্তাহীন অসহায়তায় আক্রান্ত । আমাদের অসতর্ক রাজনীতি-অর্থনীতিতে পঙ্গু সমাজ গিনিপিগের মত হামাগুড়ি দিতে দেখে উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা ক্রমশ অপসৃয়মান ।

তপন একটি পরিচিত গল্পকেও কেমন করে নতুন করে তোলে ,, তার গল্প রাজপুত্রের বড় হওয়া ।বিষয় যে বীক্ষায় --বলবার ধরনে , ফর্মে, নতুন কনটেন্ট হয়ে উঠতে পারে তার দৃষ্টান্ত এই গল্পটি ।গোড়া থেকেই আসল গল্পটাকে আড়াল করে এক রাজপুত্রের রূপকথা শোনানো হয় ।মস্ত মস্ত থামঅলা এই রাজপ্রাসাদের ভেতর রাজপুত্র হয়ে বেড়ে ওঠার দিনগুলি আমার অদ্ভুত অভিজ্ঞতা "--গল্পটি ঐ অভিজ্ঞতাকে নিয়েই ।অভিজ্ঞতা যে কত বাস্তব আড়াল করে সত্যকে ও চাপা দিয়ে রাখে , তার গল্প এই ভিন্ন ধরনের রূপকথাটি । ছেলেটির কাছে বাবা রাজা মা মহারানি ।এক ভ্রান্ত চৈতন্যে সে ঘটনাগুলিকে নিজের মত করে দেখে ।রাজা বলতে যে ছবি ধারনা ছেলেটির মধ্যে রূপকথার সূত্রে গড়ে উঠেছে তা দিয়েই সে তার বাবাকে দেখতো ।হরেন মন্ডল , মবিনুস হক ---এদের সে প্রজা ভাবত।তাঁদের অসুবিধা হত কিনা খোঁজ নিত ।কারন তার বাবা তো সর্বদাই বাহিরে নানা কাজে রাজ্য জয় করতে যেত ।ছেলেটি নদীকে শাসন করতে চাইত ।বাবা দুএকদিনের জন্য বাড়ি এলে প্রজারা দেখা করতে আসত, তাদের অসুবিধা হত কিনা খোঁজ নিত ।কারন তার বাবা তো সর্বদাই বাহিরে ।তার মনে হত বাবা টাকা দিয়ে সাহায্য করছে ।প্রজারা বলে , ছেলেটিকে তোমার বাবা সারা বছর এ রকম বাইরে বাইরে থাকলে তো মহা মুসকিল ।তারা মহারানির কাছে যায় --কেউ কেউ শির ফুলিয়ে টাকার জন্য চেঁচামেচি করে ।রাজপুত্র ক্রোধে বেরিয়ে পড়ে পথের দুপাশে তার প্রজাদের অভছুট্টির পাতানো বেত মারে বেয়াদপ প্রজাদের শাসন করে ।

ছেলেটি অবশ্য দেখে তাদের রাজপ্রসাদ বড় হলেও পুরানো জীর্ণ ।অবশেষে একদিন বাবা আসে ।প্রজারা কোন কথা শোনেনা ।টাকা না দিলে চলবে না--- ছেলেকেও তারা আর দা-ঠাকুর বলছে না বলছে 'খোকা' ।প্রজারা চেঁচাতে থাকে -----বিপর্যস্ত বাবা কাল আসতে বলে ।মা কাঁদতে থাকে ।পরদিন ভোর হওয়ার আগেই বাবা চলে যায় ----- হয়ত পুনর্বার রাজ্য জয় করতেই ।চিৎকার চেঁচামেচিতে রাজপুত্র বিভ্রান্ত ।কেয়ার টেকার এসে বলে , সে তখনই জমিদার বাবুকে বলেছিল , লোকটার গতিক ভাল নয় ।জমিদার কলকাতায় থাকেন -----এত বড় বাড়ি মেরামত করা যাচ্ছে না , একজন থাকুক এই হপ্তাতেই এদের রাখা ।এখন চাল বিক্রেতা , মুদীর দোকানের লোকটা চীৎকার করতে থাকে ।টাকা না দিয়ে রাজা পালিয়েছে ----- ভদ্দর লোক না কচু।তাহলে দেশে ঘরে বউ ছোল মেয়ে থাকতে আর একটা মেয়ে জুটিয়ে এখানে সংসার পাতে ।এখন কেয়ারটেকার মহারানি-রাজপুত্রকেও বার করে দিতে চায় , প্রাসাদের উত্তরের অংশ আগেই ভেঙে পড়েছিল ।এখন গোটা বাড়িটাই যেন সশব্দে, সরবে নীরবে বা নিঃশব্দে ভেঙে পড়ল --এ সব কি সত্যি ।এগল্পে একটি ছেলের কল্পনার জগৎ ভাবনা আছে ।রূপকথা তাকে বাস্তবকেঅন্যরকম দেখিয়েছে ।সেই সঙ্গে আছে আমাদের বাস্তবও ----জীর্ন বাড়িতে বসেও আমরা বুঝতে পারি না এ বাড়ি সরবে নীরবে সশব্দে নিঃশব্দে ভাঙছে আমরা বুঝি না কোন ভয়াবহ সংকটে আমরা অভিনয় করছি ----একটা মানুষের চিত্রকল্পে একটা প্রতারনার জাল স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই গল্পে ।

বলাই বাহুল্য , তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সব গল্পের পরিচিতি আমরা দিচ্ছি না ।কত সুখপাঠ্য কৌতুকময় আবার নিষ্ঠুর গল্প তিনি লেখেন --'রোপণ', 'ক্রশ-কানেকশন ' , অনর্থ সংহিতা , কিংবা 'অনমনস্ক প্রেমিক' কিংবা ইয়োরস ফেথফুলি ''রাজ্যপালের অসুখ',' হাফবয়েল ', সাপ -এর মত গল্প ।আমাদের বলার কথা তপন কখোনই গল্পকে অ-পাঠযোগ্য করেননা ।

সুখপাঠ্যতাকে তিনি দোষ ভাবেন না ।গল্পকে পাঠকের মন -আবেগ -বুদ্ধি -পড়াশোনার ওপর বিশেষ চাপ না দিয়ে ও গভীর স্তরে নিয়ে যেতে পারেন গল্প নির্মানের কৌশলে আর ভাষায় স্বাদুতায় ।এই স্বাদুতা ও সারল্য , অকপটতা ও অবৈকল্য কিন্তু চর্চা করেই অর্জন করতে হয় ।এতে তিনি সর্বদাই সফল হন তা নয় --- কিন্তু যেখানে সফল হন সেখানে তঁার গল্প পাঠককে ধরে রাখে ।এ রকম গল্পের সংখ্যা কম নয় ।তপন পাঠকদের কথা মনে রেখেই গল্প লেখেন আর তাঁর বেশ কিছু গল্প পড়ে মনে হয় পাঠকের বোধ ও বুদ্ধিতে তাঁর আস্থা আছে ।ঐ আস্থা থেকেই গল্পকে তিনি তৈরি করেন । গল্পগুলির পর্বে তাই নানা স্তরিক হয় --যার যেমন চি ও বোধ সে তেমনভাবে ই এ গল্পগুলিকে নেয় ।তপন বন্দ্যোপাধ্যায় তাই সহজেই পাঠকের মধ্যে ঢুকতে পারেন ।

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com